‘হাতে খড়ির আগেই পাঠ শেষ’

নূহ.উল.আলম লেনিন

অবশেষে এক অঙ্কের প্রহসনটির যবনিকাপাত হলো। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক প্রহসনের রচয়িতা ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নিজে ডিরোজিও শিষ্য ইয়ং বেঙ্গলদের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও ওই ইয়ং বেঙ্গলদেরই জীবনচর্যা এবং কথা ও কাজের অসঙ্গতিকে উপজীব্য করে মাইকেল রচনা করেছিলেন তার বিখ্যাত প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজপতির লাম্পট্যের কাহিনী সংবলিত ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।’ মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীকালে আরও অনেকে এ ধরনের একাঙ্কিকা বা প্রহসন রচনা করেছিলেন। উনিশ ও বিশ শতকের বাংলাসাহিত্য ভাণ্ডার বহুশক্তিমান লেখকের প্রহসন নাটকে সমৃদ্ধ হয়েছে। তবে সম্ভবত একবিংশ শতকে সর্বশেষ প্রহসনটি রচনা করলেন প্রথম বাংলাদেশী নোবেল জয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মহাপ্রতিভাধর ইউনূস সাহিত্যিকদের মতো গতানুগতিক ধারায় আগে প্রহসন রচনা এবং পরে অভিনয় করে তার সার্থকতা বিচারের পথ ধরেননি। তিনি আপন সৃষ্টিশীল চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগের ভেতর দিয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে একুশ শতকের চমকপ্রদত প্রহসনটি রচনা করলেন। তার প্রহসন রচনার এই সার্থকতার শুভ লগ্নে নাগরিকজনের পক্ষ থেকে তাকে আমরা জানাই মোবারকবাদ.মারহাবা।

বাঙালি জাতির সঙ্গে অতীতে অনেক রথী.মহারথী প্রতারণা করেছে, সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো অনেক স্বৈরশাসক জাতির কাঁধে চেপে বসেছে, রাজনীতির নামে, ধর্মের নামে এবং সুশাসনের নামে দুঃশাসন চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ড. ইউনূসের মতো এমন রাজনৈতিক তামাশা এবং মশকরা আর কেউ বলেছেন বলে আমাদের জানা নেই। সত্য বটে ড. ইউনূস দেশবাসীর বড়ো ধরনের ক্ষতি করার আগেই সত্যের কাছে.বাস্তবের কাছে নতি স্বীকার করে শুরুতেই রণভঙ্গ দিলেন। কিন্তু তারপরও আমরা বলবো ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। প্রথমত তিনি দেশবাসীর সঙ্গে মশকরা করেছেন, যা অশোভন, অসঙ্গত এবং তার নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। দ্বিতীয়ত, তিনি নোবেল পেয়ে নিজেকে এবং বাঙালি জাতিকে যে উচ্চতায় উঠিয়েছিলেন, প্রচলিত রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাজনৈতিক দল গঠনের আড়ম্বর করতে গিয়ে নিজেকে এবং জাতিকে ততটাই নিচে নামিয়ে এনেছেন। প্রমাণিত হয়েছে নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা রক্ষার মতো বড়ো মাপের মানুষ তিনি নন। বস্তুত অর্থ যশ (দু’টোই পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে) এবং ক্ষমতার লোভে তিনি বাঙালি জাতিকে অপমান করেছেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি উপকারও করেছেন। একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা তিনি রেখে গেলেন। রাজনীতি ব্যাপারটা যে জলবৎতরলং এবং সহজে কিস্তিমাত করার মতো নয়, সেটা যেমন তার কর্মকাণ্ড থেকে পরিস্কার হয়েছে, তেমনি যে.কেউ, তিনি যত খ্যাতিমান ব্যক্তিই হোন না কেন, চেষ্টা করলেই যথার্থ রাজনৈতিক দল গড়ে তুলতে পারেন না। ‘সুশীল’ ভদ্রলোকদের কথাই বলি আর ‘দুঃশীল রাজনীতিবিদরাই’ হোন অথবা অনক্ষর পাবলিকই হোন- কেউই আর ভেঁড়ার পাল নন। অথবা ইউনূস এমন কোনও হেমিলনের বংশীবাদক নন যে, তার বাঁশি শুনে সবাই তার পেছনে ইঁদুরের মতো ছুটবেন।

পাঠকদের বলে রাখছি, ব্যক্তিগতভাবে আমি ড. ইউনূসের প্রতি বিদ্বিষ্ট নই। আজকের কাগজের উপ.সম্পাদকীয় পাতায় ২০০৫ সালেই আমি ড. ইউনূসের নোবেল পাওয়ার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। কারণ ছিল গ্রামীণ ব্যাংকের সাফল্যের তথাকথিত মিথ সম্পর্কে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ২০০৬ সালে তিনি যখন নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন তখন আজকের কাগজের পাতায় আমি নিজেকে জাতীয় গৌরবের অংশীদার মনে করেছি এবং ড. ইউনূসের ব্যাপারে আমি পুনর্মূল্যায়ন করে ‘আমার মধুর ভুলের’ জন্য আত্মসমালোচনাও করেছি। এখন দেখছি আমার ২০০৫ সালের অবস্থানই সঠিক ছিল। দেশি.বিদেশি গণমাধ্যমের প্রচারের সুবাদে ড. ইউনূসকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যত বড়ো মাপের মানুষ হিসেবে দেখানো হয়েছে, বাস্তবে তিনি ততো বড়ো নন। বাস্তবে মধ্যমেধার প্রচারসর্বস্ব এক বামনাকৃতির ব্যক্তিত্ব তিনি। তিনি সত্যি সত্যি বড়মাপের মানুষ হতেন তাহলে দেশের প্রচলিত রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নতুন ধারার রাজনীতি প্রবর্তনের সদম্ভ অঙ্গীকার ঘোষণা করে অন্যের ওপর দায় চাপিয়ে পিছু হটতেন না। কোনও সত্যিকারের বড়মাপের মানুষ এত প্রচারসর্বস্ব এবং আত্মম্ভরী হন না। বড়মাপের মানুষ হলে যে প্যাডে তিনি নাগরিকদের উদ্দেশে চিঠি লিখে সংবাদপত্রে পাঠিয়েছেন, সেখানে নিজেই নিজেকে ‘গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা’ লিখতেন না। এটা তো কোনও পদ নয়; আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি। তাকে প্রতিষ্ঠাতা বলে সম্মান দেখাবে সাধারণ মানুষ। তিনি কেন প্রতিষ্ঠাতা লিখে আদিখ্যেতা দেখাবেন? তিনি যদি সত্যিকারের বড় মাপের মানুষ হতেন এবং জনগণ যদি তাকে ত্রাতা হিসেবে গণ্য করতো তাহলে তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সারা দেশে তার কথা মতো ‘ইউনূস সমর্থক গোষ্ঠী’ গড়ে উঠতো। যদিও তার নিজের মুখে ‘ইউনূস সমর্থক গোষ্ঠী’ তৈরি আহ্বানটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থি এবং ব্যক্তিপূজার রুচিহীন অভিপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়।

যে কোনও নাগরিকের রাজনীতি করার এবং রাজনৈতিক দল করার অধিকার আছে। ড. ইউনূসের রাজনৈতিক দল করার অধিকার নিয়ে আমরা কোনও প্রশ্ন তুলব না। দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অনেক বক্তব্যের সঙ্গেও আমরা সহমত পোষণ করি। তিনি যদি নিজ বিশ্বাস ও অঙ্গীকারের প্রতি সৎ থেকে দেশের কল্যাণে নতুন ধারার একটি রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেন তখনও আমরা দল গঠনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তার কিছু রাজনৈতিক বক্তব্যের সমালোচনা করেছিলাম। এখন যে তিনি রাজনীতি ঘোষণা দিয়েছেন সেটিও তার গণতান্ত্রিক অধিকার। আজকের কাগজ’র ভাষায় ‘হাতে খড়ির আগেই পাঠ শেষ’ করলে অন্যের কী বলার আছে। আমরা বড় জোর যে ব্যক্তি হাতে খড়ির আগে পাঠ শেষ করেন তাকে নিরক্ষর বলতে পারি। রাজনৈতিকভাবে ড. মুহাম্মদ ইউনূস নিজেকে অক্ষরজ্ঞানহীন এবং স্কুল পালানো হিসেবেই প্রমাণ করলেন।

তার প্রতি দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং সংবর্ধনাকে তিনি তার রাজনীতির প্রতি সমার্থক মনে করলেন। তার আত্মম্ভরিতা এমন মাত্রায় পৌঁছলো যে, তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন। রাজনীতিবিদদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঢালাও মন্তব্য করে বললেন, রাজনীতিবিদদের কোনও আদর্শ নেই, দেশের সকল রাজনীতিবিদ কেবল টাকা কামানোর জন্য রাজনীতি করেন। মানুষ হোঁচট খেলো।

মুখে গণতন্ত্রের যতো বুলিই তিনি কপচান না কেন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও তার নেই। দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে, দলের ‘নাগরিক শক্তি’ নামকরণ, ইউনূস সমর্থক গোষ্ঠী গঠনের আহ্বান, দলের লক্ষ্য.উদ্দেশ্য ঘোষণা এবং দল গঠন না করার সিদ্ধান্ত, সব কিছুই তিনি করেছেন একক সিদ্ধান্তে। অথচ সমিতি, সংগঠন বা রাজনৈতিক দল কোনও কিছুই একা একজন ব্যক্তি করতে পারেন না। ব্যাপারটা ড. ইউনূসও বোঝেন। তাই তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও সুশীল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গসহ সমাজের নানা পেশার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেছেন। দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক সঙ্কটের পটভূমিতে তার মতো নোবেল লরিয়েট নতুন

ধারা রাজনীতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, দেশের কল্যাণকামী অনেকেই তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং তাকে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের কোনও ভূমিকা ছিল না।

ইউনূস পক্ষান্তরে মানুষের উৎসাহিত করার বিষয়টিকে ভুল সিগন্যাল হিসেবে গ্রহণ করলেন। কাউকে সাধুবাদ জানানো, উৎসাহিত করা অথবা সমর্থন জানানো আর সক্রিয় রাজনীতি করা বা তার দলে যোগদান করা যে এক কথা নয়, রাজনীতিতে অর্বাচীন ড. ইউনূস তা বুঝতে পারেননি। এতো ক্রিকেট বা বল খেলার মতো। আমরা কেউ আবাহনী বা মোহামেডানের সমর্থক হতে পারি, নিজের পছন্দের দলকে প্রবলভাবে উৎসাহ যোগাতে পারি, এমনকি প্রয়োজনে পছন্দের দলের পক্ষে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারি কিন্তু আমরা খেলতে পারি না। খেলাটা সীমাবদ্ধ দুই দলের ১১+১১=২২ জনের মধ্যে। হার জিতের কৃতিত্ব বা দায়.দায়িত্ব দলের ওই খেলোয়াড়দের। হারজিতের জন্য কেউ দর্শক বা সমর্থকদের দায়ী করে না। অথচ ড. ইউনূস নিজের ব্যর্থতার আত্মসমালোচনা না করে দল গঠন করতে না পারার দায় চাপালেন উৎসাহ দাতাদের ওপর।

গত ৪ মে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তার খোলা চিঠিতে বলেছেন, '... ক্রমেই আমার কাছে পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে, যাদের সঙ্গে পেলে এরকম দল গঠন করে জনগণের সামনে একটি সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো তাদের আমি সঙ্গে পাচ্ছি না। ... কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে আনতে পারিনি। যারা প্রথম থেকে উৎসাহ দেখিয়ে এসেছিলেন, তাদের উৎসাহও দেখলাম ক্রমে কমতে শুরু করেছে।'

ড. ইউনূস দল করতে না পারার দায় যারা তাকে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন প্রকারান্তরে তাদের ওপর চাপিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে এই তারাটা কারা? একটা প্রবল ধারণা চালু ছিল বিদ্যমান 'রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার' পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বা সেনাবাহিনীর আশীর্বাদপুষ্ট একটি সৎ মানুষের দল গঠন হতে চলেছে। সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল মঈন উ আহমেদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতির সেমিনারে বক্তৃতা এবং একটি গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক জেলায় জেলায় 'সৎ যোগ্য' রাজনীতিবিদদের তালিকা করার যে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে রাজনীতি সচেতন জনমনে এই ধারণাই জন্মেছিল যে, ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সামনে রেখেই ওই নতুন দল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। কোনও কোনও দৈনিক পত্রিকা একে 'কিংসম্যান পার্টি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। অতীতে বাংলাদেশে ক্ষমতা দখলকারী সেনা শাসকরা (জিয়া ও এরশাদ) রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক দল গঠন করেছিল। ড. ইউনূসও যে অন্য কারও এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যই দল গঠনের ব্যাপারে অতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, তা এখন নিশ্চিত করে বলা যায়। কারণ সম্প্রতি সেনাবাহিনী প্রধান ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর বাসভবনে ডিনার পার্টিতে দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী ও যুগান্তর সম্পাদক গোলাম সারোয়ারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সেনাবাহিনীর যেমন রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, সে কারণে কোনও রাজনৈতিক দল গঠনের প্রশ্ন ওঠে না। আমরা দেখেছি সেনা প্রধানের এই বক্তব্যের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একাধিক উপদেষ্টাও ওই কথার প্রতিধ্বনি করে সরকারি উদ্যোগে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনেরও সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। মজার ব্যাপার হলো, তারপরই ড. ইউনূস রাজনৈতিক দল গঠন থেকে তার বিরত থাকার ঘোষণা দিলেন। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়?

রাজনৈতিক দল কেবল একজন বা কতিপয় ব্যক্তির ইচ্ছায়ই গড়ে ওঠে না। নামসহ রাজনৈতিক দলের কাঠামো হয়তো যে কেউ বা যে কোনও গোষ্ঠী দাঁড় করাতে পারে। তবে জনসমর্থনপুষ্ট, দেশের

রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে জনগণের আস্থাভাজন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠতে পারে। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ.সুবিধা দিয়ে আমাদের মতো দেশে এখনও রাজনৈতিক দল গঠন করা যেতে পারে বটে। তবে তৃণমূল পর্যন্ত তা কতটা জনসমর্থন পাবে, ক্ষমতা বলয়ের বাইরে টিকে থাকার সামর্থ্য তার কতটা থাকবে সে প্রশ্ন থেকেই যাবে।

ড. ইউনূসের সাম্প্রতিক উদ্যোগ থেকে যে শিক্ষাটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল গঠন করা যায় না। সাবজেকটিভ ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্বশর্ত তথা অবজিকটিভ কন্ডিশন থাকা চাই। দ্বিতীয়ত ব্যক্তির ভিন্ন ক্ষেত্রের যোগ্যতা বা জনপ্রিয়তাই একটি দল গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। তৃতীয়ত, রাজনীতি ও রাজনীতিবিদের চরিত্র হনন করে আবার সেই রাজনীতিরই আশ্রয় গ্রহণকে জনগণ ভালো চোখে দেখে না, ব্যাপারটা অনৈতিক। চতুর্থত, অতীতের মতো অন্য কারও এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইচ্ছে করলেই জনগণকে ভেড়ার পালের মতো ব্যবহার করা যাবে না। বাংলাদেশের মানুষ এখন অনেক বেশি রাজনীতিসচেতন। আর শেষ কথা হচ্ছে ভালো ব্যাংকার বা ভালো ব্যবসায়ী (২০০৫ সালে বিশ্বের সেরা ২৫ ব্যবসায়ীর তালিকায় ড. ইউনূসের নাম উঠেছিল) হলেই ভালো রাজনীতিবিদ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ নয়। ড. ইউনূস বরং বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্যকে পুঁজি করে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার দারিদ্র্য.বাণিজ্যকে আরও জোরদার করলে ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত তার ইমেজকে মেরামত করতে পারেন।

পাদটিকা: রাজনৈতিক অঙ্গনে হাসিনা.খালেদাকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে তারা যথাক্রমে ২৬ ও ২৩ বছর যাবত দলের সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকবেন কেন? একই প্রশ্ন কি ইউনূসের ব্যাপারেও প্রযোজ্য নয়? তিনি আর কতকাল গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি থাকবেন, পঁচিশ বছর তো হতে চললো!

০৬.০৫.০৭

নূহ.উল.আলম লেনিন: রাজনীতিক ও কলাম লেখক।